

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 98 - 105

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

নির্বাচিত রাম-কথায় 'লিঙ্গ-সীমা'র পুনর্নির্মাণে অরণ্য

সৌপ্তিক কুমার মান্না

Email ID: souptik.manna@gmail.com

ID 0009-0001-2579-1350

Received Date 20. 01. 2026**Selection Date 10. 02. 2026****Keyword**

Gender,
Ramkatha,
forest, binary,
tradition,
adaptation,
representation,
reconstruction,
agency,
conflict.

Abstract

Although the Ramkatha had long held a place in Bengali oral tradition and storytelling, more mature literary adaptations emerged after the Turkish invasion, most notably with the Krittivasi Shri Ram Panchali. Due to its simplistic style and expressive form, the Ramkatha, which has been interpreted by a range of poets, has come to represent a distinctive cultural and literary paradigm. These shifts carried this tradition beyond its familiar home-bound confines into a wider cultural domain. Within this space, in opposition to the epic's structural transformations, narratives of divine greatness, and assertions of masculinity, a female-centric perspective took shape with time. Moreover, the multifaceted portrayal of female characters in these alternative narratives redefined traditional understandings of gender in significant ways. Building on these perspectives, this research paper aims to examine how traditional notions of gender have been dismantled and redefined within the selected narratives.

The forest serves as the site where traditional gender norms are unsettled. It is simultaneously a space that echoes Sita's grief and a zone of power conflicts involving Surpanakha and Taraka. Set against the backdrop of the forest, which frequently emerges as a dynamic character in its own right, these narratives depict female agency in layered and varied forms that defy fixed gender roles and dualities. This research, therefore, not only explores women's positions and systems of oppression but also studies how these texts question, complicate, and often reject the gender dichotomies that have long defined gender.

Primary sources consulted in this study include the Bengali translation of the Shreemadvalmikiya Ramayan by Sanat Kumar Bandopadhyay, Krittivasi Ramayan edited by Sukhamoy Mukhopadhyay, Chandravati's Ramayan edited by Koyel Chakraborty, and a graphic novel inspired by Chandravati's version, Sita's Ramayana, by Samhita Arni and Moyna Chitrakar. These texts have been examined through a comparative and interpretive framework, with a particular focus on their depiction of gender biases and binaries. The study seeks to trace and examine the narrative strategies through which these retellings of the Ramkatha articulate diverse gendered experiences and identities through the representation of the forest.

Discussion

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যধারায় সহজ সরল প্রকাশ ভঙ্গির জন্য কৃত্তিবাস পরবর্তী রামায়ণের কাহিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী বহু কবির হাত ধরে বারবার নতুন নতুন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যে উপস্থাপনাগুলিতে চিরাচরিত মহাকাব্যিক কাঠামোর মধ্যেও একটা ব্যতিক্রমী চিন্তা-ভাবনার অভিমুখ পরিলক্ষিত হয়। যার সূত্রপাত বলা যেতে পারে ষোড়শ শতকের শেষে কবি চন্দ্রাবতীর হাত ধরে। রাম-আখ্যানকে দেখার, পড়ার, উপলব্ধি করার পুরো ধাঁচটাই পাল্টে দিয়েছিল তাঁর আখ্যান। চন্দ্রাবতীর সীতাকেন্দ্রিক কাহিনি পরবর্তী কবিদের হাতে চিরায়ত দেব-মাহাত্ম্য, যুদ্ধ বর্ণনা, ক্ষমতায়ণের চিত্রণের মধ্যে দিয়েও নারী চরিত্রের সক্রিয় উপস্থাপনে আরও বৃহৎ অর্থে নারী-কেন্দ্রিক হয়ে উঠতে শুরু করলো। এই পরিবর্তনের হাত ধরেই রামায়ণ গবেষণায় বারবার প্রশ্ন উঠে আসতে লাগল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, পুরুষের ক্ষমতা, নারী-অধিকার, সমাজে নারীর অবদমনের মতো বিষয় নিয়ে। এককথায় বলতে গেলে সামাজিক কাঠামোয় তৈরি করে দেওয়া লিঙ্গ-ধারণার বিপরীতে উঠে আসছে কিছু দ্বন্দ্বিক ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু রাম-কাহিনি শুধুমাত্র লিঙ্গভিত্তিক বৈপরীত্য, ক্ষমতায়ণ বা নারীকেন্দ্রিকতার কথা বলে তা নয়, বরং লিঙ্গ-সীমার সাদা-কালো ধারণার গণ্ডীটাকে মুছে ফেলার কাজও করে চলে প্রচ্ছন্ন ভাবে। রাম-আখ্যানে মূলত অরণ্য-কেন্দ্রিক কাহিনি ও অরণ্যের উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে এই কাজের সূত্রকে খুঁজে পাওয়া যায়।

এই সূত্রে একটি বিষয় সম্পর্কে বলে নেওয়া দরকার। চিরায়ত ধারণার বাইরে গিয়ে বা চেনা ছকের মধ্যে আটকে না থেকে কোনো বিষয়কে নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করাকে অনেকেই ডিকনস্ট্রাকশনের আওতায় নিয়ে আসেন। মৃগালকান্তি ভদ্র দেবদার বিনির্মাণের ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন - পুরনোর ইতি (ডিস্ট্রাকশন) আর নতুনের শুরু (কনস্ট্রাকশন) - এই দুই ধারণার মিলিত রূপ হল ডিকনস্ট্রাকশন (হোসেন, আলম ১৩৩)। এই ডিকনস্ট্রাকশনের বাংলা পরিভাষা নিয়ে নানারকমের মতপার্থক্য আছে। বহুল প্রচলিত বাংলা পরিভাষা 'বিনির্মাণ' ছাড়াও বিমলকৃষ্ণ মতিলালের মতে এর বাংলা হতে পারত 'অবিসংযোগ'। আবার প্রাথমিক ভাবে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক্ 'বিনির্মাণ'-কে মেনে নিলেও তাঁর মতে "ডিকনস্ট্রাকশন তো শুধু বিশেষরূপে নির্মাণ নয়, বিশেষরূপে অনির্মাণও বটে।" (হোসেন, আলম ১১) তিনি তাই, 'অবিনির্মাণ' ব্যবহারেই বেশি যত্নবোধ করেছেন। এই প্রবন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে এই জটিলতার মধ্যে না গিয়ে 'পুনর্নির্মাণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে, রামায়ণের মতো আখ্যান আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতির একটা কালগত পার্থক্যের কথা মাথায় রাখতেই হয়। সেই দিক থেকে রাম-আখ্যানের মধ্যে লিঙ্গ-ধারণার আধুনিক রূপ খুঁজে না পাওয়া বা খুঁজতে গিয়ে সে সম্পর্কে একমুখী সমালোচনা করা - একপ্রকারের গবেষণা-দোষ হিসেবেই পরিগণিত হবে। কিন্তু, সেই সময়ে দাঁড়িয়েও আখ্যানের মধ্যে লিঙ্গ-ধারণার যে ভাঙা-গড়া, প্রথাগত ধারণার মধ্যেও আধুনিকতার যে স্পর্শ এবং এই দুইয়ের যে সহাবস্থান, সমন্বয় - সেইসব কিছু মিলিয়েই মনে হয়েছে রাম-আখ্যান পাঠকের কাছে ভাবনার বহুমুখী দ্বার খুলে দিয়েছে।

শুধুমাত্র বাংলা রামায়ণেই নয়, বরং বাল্মীকির রামায়ণ থেকেই এই লিঙ্গ-সীমা'র ধারণাকে নিয়ে বারবার দোটানার সূত্রপাত লক্ষ্য করা গেছে। তাই এই গবেষণা প্রবন্ধের আলোচনায় আদি রামায়ণ হিসেবে বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গানুবাদ এবং তার সাথে প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা রামায়ণ হিসেবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, রাম-কাহিনির অভিমুখ পরিবর্তনকারী চন্দ্রাবতীর রামায়ণ এবং চন্দ্রাবতীর কাহিনি ও নারী-কেন্দ্রিক ভাবধারা নির্ভর সংহিতা আর্নি ও ময়না চিত্রকরের *Sita's Ramayana* নামাঙ্কিত 'ছবিগল্প'কে গ্রহণ করা হয়েছে।

রামায়ণের কাহিনির দিকে তাকালে খুব সহজেই বোঝা যায় একটা বৃহৎ ক্ষেত্র জুড়ে অবস্থান করে আছে অরণ্য। এক প্রকার বলা যেতে পারে আখ্যানের অগ্রগতির মূল ভিত্তিভূমিই হল অরণ্য ও অরণ্য-কেন্দ্রিক কাহিনি। অপর্ণা রায় তাঁর "মাধব কন্দলীর রামায়ণ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ একটি তুলনামূলক পাঠ প্রতিক্রিয়া" প্রবন্ধে যেমন কৈকেয়ী এবং সীতা-এই দুই নারীকে পারিবারিক রাজনৈতিক পরিসরে রামের জীবনের পথ নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তেমনই বলা যায় রাম-আখ্যান দাঁড়িয়ে আছে দন্দকারণ্য, আশোক বন ও বাল্মীকির তপোবন - এই তিনের এক অদৃশ্য যোগসূত্রে। কিন্তু, এই অরণ্য ও অরণ্যের কাহিনির চিত্রণ পালটে যায় সময় ও বিভিন্ন কবির হাত ধরে।

রাম-কাহিনীতে অরণ্যের বিবরণে কৃত্তিবাস মূলত বাল্মীকি অনুসারী। বাল্মীকির কাহিনীতে বিশ্বামিত্র যেমন ভাবে বনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন “দারুণং বনম্” (শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ, প্রথম খণ্ড ৬০) ঠিক একইরকম ভাবে কৃত্তিবাসও বনের বিবরণ দিতে গিয়ে প্রথমেই তাকে একটা ভয়াবহ রূপদান করেছেন – “এই বনের কথা শুন বড়ই বিষম।।” (মুখোপাধ্যায় ১১২) আসলে প্রথাবদ্ধ মহাকাব্যিক পরিকাঠামোয় বন বা অরণ্যকে মূলত কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে আছে ভয়ঙ্কর রাক্ষস-রাক্ষসীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র, মুনি-ঋষিদের তপস্যার যথার্থ স্থান, পারিবারিক বা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজপরিবার থেকে দূরে বনবাসী জীবন কাটানো, মৃগয়ার মধ্যে দিয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহুবল প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলি। অর্থাৎ, অরণ্য হয়ে উঠেছে এমন একটি কঠোর-কঠিন ক্ষেত্র যার সাথে শাস্তি, কষ্টসাধন, হিংসা, ক্ষমতায়নের মতো বিষয়গুলি সংযুক্ত হয়ে আছে এবং এই সব কিছুই খুব সুস্পষ্ট ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি করে দেওয়া পুরুষালী বৈশিষ্ট্য বা পুরুষ নির্ধারিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদিকে চন্দ্রাবতীর রামায়ণে অরণ্যের উপস্থাপন সম্পূর্ণত অন্য একটা অনুভূতি বয়ে আনে। রামায়ণের শুরুতেই (১ম খণ্ড, জন্মলীলা) যেমন লঙ্কার অশোক বনের শোভাকে ইন্দ্রের নন্দন কাননের সঙ্গে তুলনা করেছেন (চক্রবর্তী ১৯৩) তেমনই আবার বারোমাসীর বর্ণনায় সীতা রাজপরিবার থেকে দূরে বনবাসী জীবনের সুখে রাজ্যপাট, রাজ সিংহাসনের কথা ভুলে যাওয়ার প্রসঙ্গ এনেছেন –

“রসাল বনের ফল গো, পাতার কুটিরে পাইয়া।

অযোধ্যার রাইজ্যপাট গো, গেলাম যে ভুলিয়া।।

... ..

কি করিব রাইজ্যসুখ গো, রাজ সিংহাসন।” (চক্রবর্তী ২১৪)

অর্থাৎ, এখানে অরণ্য চিরাচরিত হিংসাত্মক চরিত্র নিয়ে বর্ণিত হয়নি বরং তার বিপরীতে রাজনৈতিক ক্ষমতার লালসা, পারিবারিক চক্রান্ত থেকে অনেক দূরে এই অরণ্য এক শান্ত-শান্তির জীবন প্রদান করেছে। সেখানে প্রাত্যহিক চাহিদার উর্দে জীবনকে যাপনের বিষয়টাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং, বলা যেতে পারে শুধুমাত্র কাহিনি বা চরিত্রের চিত্রণের পরিবর্তনই নয়, বরং অরণ্য জীবনের কথা বলতে গিয়ে চন্দ্রাবতীর ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি আদ্যপান্ত পুরুষালী মহাকাব্যিক গঠনটাকেই পাশ কাটিয়ে গেছে।

আর এরই সূত্র ধরে সংহিতা আর্নি আর ময়না চিত্রকরের *Sita's Ramayana* আমাদের শুরুতেই নিয়ে চলে যায় অন্য এক উপলব্ধিতে। যেখানে অরণ্য শুধুমাত্র কাহিনির ক্ষেত্র বা দৃশ্যপটের ভূমিকা পালন করছেন বরং হয়ে উঠেছে কাহিনির সক্রিয় চরিত্র। গোটা অরণ্য সীতার কষ্টকে বোঝার চেষ্টা করছে, গাছ, গাছের পাতা দুঃখিনী সীতার চিরকালীন অবরুদ্ধ অস্ফুট স্বরকে শোনার চেষ্টা করছে “The forest watched her... the plants edged closer still and the leaves bent to catch her words.” (আর্নি ৮-৯) আসলে মনে হয় চন্দ্রাবতীর সীতার “শুন সখীগণ”-এর (চক্রবর্তী ২১৪) স্বর ছবিগল্পে সম্পর্কের আরও নিকট পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বিতারিত নারী হয়ে উঠেছে ‘ভগিনী’ – “Tell us, sister how you came here.” (আর্নি ৯)। কিন্তু, এই বনবাসী নারীকে ভগিনী সম্বোধনের ঘরোয়া পরিচিতির স্নেহের আশ্রয় স্থানের চরিত্র সম্পূর্ণত পালটে যায় যখন এই অরণ্যই সীতা-হরণের মূল পটভূমি রচনা করে। আসলে পুরুষ-পুরুষে ক্ষমতার লড়াইয়ে দর্প বা সম্মান রক্ষার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায় নারীকে রক্ষা করতে পারা না পারার উপর। তাই কৃত্তিবাসের রাবণ বলে “সীতারে হরিয়া লৈয়া দর্পচূর্ণ করি।।” (মুখোপাধ্যায় ১৯২) *Against Our Will: Men, Women and Rape* গ্রন্থে সুস্যান ব্রাউনমিলার এই ঘটনাকেই “...property crime of man against man” (১৮) বলে উল্লেখ করেছেন। ফলত, এই ক্ষেত্রে চন্দ্রাবতীর অরণ্যের অহিংস চরিত্র (চক্রবর্তী ২৩২) কিংবা আর্নি ও চিত্রাকরের নিশ্চুপ বন, বনের সুখকর জীবনের রূপ পালটে গিয়ে নারীর কাছে পুরুষ-কেন্দ্রিক ভীতির সম্ভরণ করে। সীতা-হরণের বাইরেও বিশ্বামিত্রের বশিষ্ঠের কাছ থেকে শবলা কামধেনু বলপূর্বক অধিকার করতে চাওয়ার মধ্যেও অরণ্য বা অরণ্য-কেন্দ্রিক আশ্রম তার চিরচেনা চরিত্রকে ছাপিয়ে যায়। বলা যায়, পৌরুষের অহংকার, ক্ষমতালিপ্সু মনের আগ্রাসন যপ-তপ-ধ্যানের তথা বানপ্রস্থ জীবনকেও রেয়াত করেনা।

কিন্তু, সীতার বনবাসী জীবনকে যদি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় – প্রথম পর্যায়ে রাম-লক্ষ্মণের সাথে বনবাসী হয়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ে অশোক বনে বন্দিণী হয়ে এবং তৃতীয় পর্যায়ে রাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সীতার বাল্মীকির তপোবনে জীবন কাটানো – তাহলে স্পষ্ট ভাবে দেখা যাবে প্রথম পর্যায়ের সীতা চরিত্র পরবর্তী দুই পর্যায়ে অনেক বেশি বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাই, বাল্মীকির রামায়ণে বন্দিণী সীতা রাবণের হাজার প্রলোভন, কটুক্তি, কু-প্রস্তাব উপেক্ষা করে চিরাচরিত পুরুষ অধিকৃত ‘অবলা নারী’র পরিচয় সরিয়ে দিয়ে নিজের স্ব-ক্ষমতার কথা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারে – “আমার তেজোরশি তোমাকে ভঙ্গীভূত করার পক্ষে যথেষ্ট।” (শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ, দ্বিতীয় খণ্ড ৮৪) অর্থাৎ, এই সীতা শুধুমাত্র অসহায় নারী নয়, শুধুমাত্র রামের সেবা পরায়ণ পতিব্রতা স্ত্রী নয় বরং তার বিপরীতে এই সীতা তপশ্চর্যায় সিদ্ধ তেজস্বী নারী। কিন্তু, সব কিছুর পরেও সীতার এই স্ব-ক্ষমতাকে ‘রামের আদেশ’-এর গণ্ডীর মধ্যে আটকে সামাজিক ভাবে নারীর মানসিক অবদমনকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, বিভিন্ন আখ্যানের মধ্যে অরণ্য ও অরণ্য-কেন্দ্রিক কাহিনি চিরাচরিত লিঙ্গ ধারণার মোটা দাগের রেখাকে সম্পূর্ণ মুছে দিতে না পারলেও আখ্যানের মধ্যে লিঙ্গ-সীমার ধারণাকে নিয়ে ভাঙা-গড়ার কাজ করেছে।

প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত রাম-কাহিনিগুলো পাঠ করলে মনে হতে পারে রচয়িতাদের লিঙ্গ পার্থক্য হেতু এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আখ্যানে লিঙ্গ ধারণার প্রকাশে বারবার একটা চিরাচরিত ধারণায় ফিরে যাবার প্রবণতা আছে। কিন্তু, পৌরুষ ও তার ক্ষমতায়নের সামাজিক কাঠামোয় নারীর অবস্থান সংক্রান্ত যে টানাটানা সেটা যেন ভেঙে পড়ে তাড়কা চরিত্রের হাত ধরে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাড়কা চরিত্রের মাত্র কয়েক ছত্র বর্ণনায় মূলত তার কদাকার নেতিবাচক রাক্ষসী সত্ত্বারই উপস্থাপন করা হয়েছে –

“মনুষ্যের চর্ম তার গায়ের কাপড়।

মনুষ্যের মুন্ড তার কানের কুন্ডল।।” (১১২)

কিন্তু, বাল্মীকি রামায়ণে এই চরিত্রের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাম-কাহিনীতে সন্তান হিসেবে পুত্র সন্তানই যেখানে কাঙ্ক্ষিত সেখানে বাল্মীকিয় রামায়ণে সুকেতু ব্রহ্মার তপস্যা করে লাভ করল সহস্র হস্তির বলে বলীয়ান, মহাযশস্বী কন্যা তাড়কাকে। এছাড়াও তাকে ‘রূপযোয়বনশালিনীম’ (শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ, প্রথম খণ্ড ৬১) বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, তাড়কা প্রথম থেকেই চারিত্রিক স্বভাবে যে ভীষণ প্রকৃতির ছিল এমনটা নয়। বরং, ব্রহ্মা লোকপীড়নের ভয়েই সুকেতুকে পুত্র সন্তান প্রদান না করে কন্যা সন্তান প্রদান করেছিলেন। ফলে, কাহিনির সূত্র অনুযায়ী এটা অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে কন্যা বা নারী সমাজের পক্ষে অহিতকর হতে পারে এমন ভাবনাতেও কোথাও একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। অর্থাৎ, দৈহিক শক্তি আর সৌন্দর্যের যে প্রথাগত লিঙ্গভিত্তিক বিভেদ সেটা যেন কোথাও এই চরিত্রটি তার গণ্ডীটাকে পেরিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে একদিকে যেমন অগস্ত্য মুনি তাকে বিকৃতরূপা, মহারাক্ষসী হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দিচ্ছেন তেমনি রামও নারীত্বহেতু তার প্রাণরক্ষা করলেও হাত-পা কেটে তার বলবীর্য খর্ব করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, লিঙ্গ-সীমার ধারণায় নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যকে লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়, যেখানে বলবান বা বীর্যবান হওয়া যেমন পৌরুষের সাথে সংযুক্ত তেমনি সুন্দর বা রূপের ধারণা নারীত্বের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু তাড়কা চরিত্রের মধ্যে এই দুই-এর একত্র সহাবস্থানে চরিত্রটি সীমা লঙ্ঘকারীর মূর্ত প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই প্রতীকি চরিত্রকে সাদরে গ্রহণ করার মতো মানসিক পরিকাঠামো না থাকায় চরিত্রের গৌরব, সক্ষমতা খর্ব করে পুনরায় তাকে লিঙ্গ-সীমার অন্দরে ঠেলে দেওয়ার জন্য অগস্ত্য মুনি কিংবা রাম-এর ঘটনার প্রয়োজন পড়েছে।

তাড়কার পাশাপাশি অন্য এক বনবাসী চরিত্র শূর্ণনখার মধ্যেও স্ব-ক্ষমতার একটা সোচ্চার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাল্মীকি রামায়ণে যেমন একদিকে সে স্পষ্টভাবেই নিজেকে ‘রাক্ষসী’ (শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ, প্রথম খণ্ড ৫৪৪) বলেই পরিচয় দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি কৃত্তিবাসের শূর্ণনখা ‘পরম কামিনী’ (মুখোপাধ্যায় ১৮৩) রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু নিজের ক্ষমতা বা নিজের চাহিদার কথা জাহির করতে বা প্রকাশ করতে কিছুমাত্র লজ্জা বা সংকোচ তার মধ্যে কাজ করেনি। আর তাই সে বলতে পারে –

“দেশদেশান্তর বেড়াই আমি কারো নাহি ডর।

তোমার স্ত্রী হইতে আইলাম তোমার ঘর।।

... ..

কোন গুণ না ধরি আমি কোন চমৎকার।

নানা রূপ ধরিতে পারি নানা অবতার।।” (মুখোপাধ্যায় ১৮৩)

বাল্মীকি রামায়ণেও নিজের পরিচয়ে শূর্ণনথাকে বলতে দেখা যায় - ‘কামরূপিণী’, ‘সর্বভয়ংকরা’, “অহং প্রভাবসম্পন্ন স্বচ্ছন্দবলগামিনী।” (শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ, প্রথম খণ্ড ৫৪৪) কিন্তু, পুরুষের সামনে নারীর নিজের এই গুণ বর্ণনা, প্রণয়ের বা ইচ্ছার কথা বলায় শূর্ণনখা লজ্জাহীনা চরিত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের স্বেচ্ছাচার নিয়মের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়ার জন্যই মূলত নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নিজেদের বশীভূত করতে চায়। নাওমি উলফ যৌনতার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ডেবি টেলরের ধর্ম (রিলিজিওন) এবং যৌন তৃপ্তি সম্পর্কে একটা মন্তব্য তুলে ধরেন - “religious beliefs had little or no effect on a man’s sexual pleasure, but could slice as powerfully as the circumcision knife into a woman’s enjoyment, undermining with guilt and shame any pleasure she might otherwise experience.” (১৫৫) এর পাশাপাশি বিমলকৃষ্ণ মতিলালের মতোই রিলিজিওন (ধর্ম)-কে যদি নীতি-নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা হয়, বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় অর্থাৎ, যে নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে এই সমাজ চালিত হয় সেখানেও দেখা যাবে বিধি-নিষেধ, অধিকার-অনধিকার প্রসঙ্গে যাবতীয় কাটাছেঁড়া তার বেশির ভাগই করা হয়েছে নারীর কথা মাথায় রেখে। যার বেশির ভাগই যতটা না নারীর মঙ্গলের জন্য, তার থেকে বেশি নারীকে পুরুষের অধীনস্থ রাখার কৌশল মাত্র।

কিন্তু এই সব কিছুর পরেও বলতে হয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণে তার সম্পর্কে যতই বলা হোক না কেন “রাশ্টি হইয়া ভাতার চাহে বড়ই দুর্মুখা” কিংবা “পুরুষ দেখিয়া রাশ্টি কামে অচেতন” (মুখোপাধ্যায় ১৮২) কিন্তু, সেই চাহিদার মধ্যে, সেই ইচ্ছার মধ্যে কোনো ছল-চাতুরীর সে আশ্রয় নেয়নি - সহজ কথা সহজ ভাবেই প্রকাশ করেছিল। এবং তার রূপের পরিবর্তন “...a demoness, in a human form...” (আর্নি ১৬) আদতে ছিল তথাকথিত সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বেড়ে ওঠা একজন নারীর অবদমিত মানসিক অবস্থার সচেতন বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যেখানে সমাজ নির্ধারিত সৌন্দর্য বা রূপের ঝাঁচায় নিজেকে গড়ে নিতে না পারলে প্রেম নিবেদন যে সম্ভব নয়, রূপই যে নারীর ভূষণ - এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে *The Handmaid’s Tale* থেকে ঋণ নিয়ে বলতে হয় - “Then I find I’m not ashamed after all. I enjoy the power; power of a dog bone, passive but there.” (অ্যাটওয়াড ২৫) এই একই স্বর আমরা কৃত্তিবাসেও পাই -

“ত্রৈলোক্য জিনিয়া রাম রূপের মুরারি।

বিকৃতি আকার সে রাক্ষসী নিশাচরী।।

... ..

রাম ভাঙিতে রাশ্টি পাতিয়াছে কলা।।

ভাবিয়া চিন্তিয়া হইল পরম কামিনী।

রামের সমুখে গেল হাস্যবদনী।।” (মুখোপাধ্যায় ১৮২-১৮৩)

অর্থাৎ, আপেক্ষিক ভাবে শূর্ণনখার রূপ-বদল পুরুষশাসিত সমাজে নেতিবাচক বা খল চরিত্রের পরিচায়ক হলেও আদতে স্ব-ইচ্ছার কথা স্পষ্ট ভাবে বলার পাশাপাশি রূপ পরিবর্তনের এই ক্ষমতাও তার স্ব-ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করে লিঙ্গ-সীমা ধারণার বিপরীতে এক ব্যতিক্রমী ধারায়। কিন্তু, আবারও গড়ে তোলা লিঙ্গ ধারণার বিপরীত শ্রোতের এই চরিত্রকে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে চলতে থাকে ক্রমাগত পরিহাস - “পরিহাস না বুঝে রাশ্টি বচন মাত্রে ধায়।” (মুখোপাধ্যায় ১৮৪) এবং কাহিনির স্বার্থে নাসিকা-ছেদনের ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাকে আবারও ঠেলে দেওয়া হল সুরূপ-কুরূপের গণ্ডিতে। আর সেই সূত্র ধরে এই ব্যতিক্রমী নারী চরিত্রের বলিষ্ঠ বয়ান ও উপস্থাপনে গবেষক পূজা মাক্কর শূর্ণনখা চরিত্রটিকে “an unwanted aspect of womanhood.” বলে চিহ্নিত করেছেন। নাওমি উলফ তাঁর *The Beauty Myth* গ্রন্থে এই রূপ, সৌন্দর্যের

বিষয়ে সুন্দর ভাবে বলেন – “The myth isolates women by generation...” (৯০), অর্থাৎ, সমাজ নির্ধারিত নারীর রূপের সংজ্ঞায় শূর্ণনখার পরিবর্তিত রূপ দেখে “পরমসুন্দরী তুমি লক্ষ্মী মূর্তিমতী” (মুখোপাধ্যায় ১৮৩) বলা সম্ভব হলেও তথাকথিত নারীসুলভ ক্রিয়াকর্মের বাইরে গেলেই সেই চরিত্রদের স্বাভাবিকত্বে ও স্বকীয়তায় হস্তক্ষেপ করতে সমাজ কিছুমাত্র পিছপা হয় না।

এই একই (রাক্ষসী প্রসঙ্গে) সূত্রে গাঁথা আরো এক নারী চরিত্র ত্রিজটার প্রসঙ্গ এখানে চলে আসে। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী উভয় রামায়ণেই ত্রিজটা প্রসঙ্গে খুব অল্প পরিসরে ‘বৃদ্ধা প্রবুদ্ধা’ (শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ, দ্বিতীয় খণ্ড ৯৭) বা ‘রাক্ষসী বুড়ি’ (মুখোপাধ্যায় ২৬৮) হিসেবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেখানে ত্রিজটা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের দ্বারা রাক্ষস রাজবংশের পতনের দিন যে এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে জানতে পেরেছে। তার এই স্বপ্নাদর্শনের ঘটনা খুব সাধারণ এবং স্বাভাবিক অর্থেই আখ্যানের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু, *Sita's Ramayana*-তে এই রাক্ষসীই ছিল আশোক বনে সীতার বেঁচে থাকার একমাত্র আশা-ভরসা। এই রাম-কাহিনীতে ত্রিজটা চরিত্রটি সক্রিয় এবং স্বকীয় উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে লিঙ্গ ধারণার তথাকথিত ধাঁচকে লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়েছে। রাবণের ভাইজি এবং বিভীষণ পুত্রী এই ত্রিজটার বিবরণ দিতে গিয়ে কাহিনিকার সীতার বয়ানে বলেন “...she was kind and compassionate.” (আর্নি ৩১) অর্থাৎ, রাক্ষসী হওয়ার সত্ত্বেও দয়া ও সহানুভূতিশীল – নারীর এই দুই চিরায়ত বৈশিষ্ট্যই তাকে অন্যান্য রাক্ষসী চরিত্র থেকে আলাদা করেছে। তাহলে প্রশ্ন হল ‘রাক্ষস’ বলা হবে কাদের? যদি পুরাণের ব্যাখ্যার দিকে তাকানো হয় তাহলে দেখা যাবে *বিষ্ণু পুরাণ* অনুযায়ী ব্রহ্মার ক্ষুধা ও কোপ থেকে জন্ম হয়েছিল ক্ষুৎক্ষামদিগের। এদের মধ্যে যারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে না খেয়ে ব্রহ্মার কথা বলেছিল তারা ‘রাক্ষস’ ও যারা খাওয়ার (যক্ষণ) কথা বলেছিল তারা ‘যক্ষ’ নামে পরিচিত হয়েছিল (১৭)। আবার বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের কাহিনী অনুযায়ী ব্রহ্মা সৃষ্ট সমুদ্রের জল রক্ষাকারী জলজন্তুরা ‘রাক্ষস’ ও সেই জলকে পূজা করতে চাওয়া জলজন্তুরা ‘যক্ষ’ নাম প্রাপ্ত হয়েছিল (৬৯৫)। ফলত, ত্রিজটার মতো রাক্ষসী কিংবা সরমা’র মতো রাক্ষস বংশের কুলবধূরা আখ্যানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকলেও তাদের স্বভাবের মধ্যে দিয়ে ‘রাক্ষস’-এর রক্ষধর্ম পালনের মধ্যে দিয়ে প্রথাগত ধারণাকে ভাঙতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু, বলা বাহুল্য তথাকথিত নারীসুলভ এই বৈশিষ্ট্যগুলি কাহিনীতে কাজ করেছে একজন অসহায় বন্দি নারীর প্রতি, তথাকথিত পুরুষ চরিত্রের প্রতি নয়। কারণ, লিঙ্গ ধারণার প্রথাবদ্ধ ধারায় মহাকাব্যিক গঠনের মধ্যে পুরুষের লাম্পট্য, ঔদ্ধত্য, শাসন, লাঞ্ছনা বারবার নারী চরিত্রের ক্ষমা করে গেছে– তাদের উদারতার জন্য নয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়মাবলীর মধ্যে বাঁধা পড়ে, অসহায় হয়ে, নিরুপায় হয়ে, ক্ষমতায়ণের এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে।

এসবের পরেও ত্রিজটার স্ব-ক্ষমতার অন্য একটি দিক হল তার ‘ভবিষ্যৎবাণী’ করতে পারার ক্ষমতা। নিকট ও দূরের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-এর বিষয়কে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা। আর সে কারণেই বন্দি সীতার উক্তি – “...Trijata promised to be my ears and eyes.” (আর্নি ৭২) এই উক্তি যেন সামাজিক একটা চলতি ছবির ক্যানভাসকে এক লহমায় চূর্ণ করে দেয়। অন্তঃপুরবাসী নারীর এক সময়ে বাইরের জগতকে জানার, শোনার, দেখার, বোঝার একমাত্র মাধ্যম ছিল পুরুষ যেখানে একজন নারীই সেই জায়গা দখল করে বসেছে রাম-কাহিনীর মধ্যে। এক কথায় ত্রিজটার দূরদর্শীতাই সীতার নিরাশার জীবনে বারবার বেঁচে থাকার ইন্ধন জুগিয়ে গেছে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র একজন নারীর অবস্থানগত স্ব-ক্ষমতার কারণে নির্ধারিত কাঠামোর বিপরীত হাওয়ায় পৌরুষের গৌরব যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে।

সাতকাণ্ড রামায়ণের সূত্রেই আবারও ফিরে আসা যাক সীতার কথায়। শুধুমাত্র প্রথমবারের বনবাস পর্বতেই রাম-আখ্যানে অরণ্যের কাহিনী শেষ হয় না বরং লোকপোবাদের উপর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গর্ভবতী সীতাকে পুনরায় একাকী বনবাসে পাঠানো হয় শাস্তি হিসেবে। শুরু হয় সীতার তৃতীয় পর্যায়ের বনবাসী জীবন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে এক্ষেত্রে দেখা যায় বাল্মীকির আশ্রয়ে বনবাসী জীবনে একাকী সীতা পুনরায় একটা পারিবারিক পরিসর পেলে ঠিকই কিন্তু রাজপরিবার থেকে মুনির তপোবন সর্ব ক্ষেত্রে সীতা পিতা-মাতা-ভাই সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকছে। তাই বাল্মীকির বয়ানে পাওয়া যায় –

“আমি হইব পিতা তোমার গো, ঘরে বসুমাতা জননী।

আমার পুত্র শিষ্য মাও গো, তোমার ছোটো ভাই।

আমার আশ্রয়ে মাও গো, তোমার কোনো ভয় নাই।।” (চক্রবর্তী ২৩১)

অন্যদিকে কৃষ্ণিবাসের রাম সীতাকে বনবাসে দিয়ে শোকাতুর হলেও পৌরুষের গৌরব তাঁকে লোকলজ্জার ভয়েই ভীত করেছে বেশি, তাই রাম বলে –

“... বর্জ্যা থুইলাম দেশের বাহিরে।

অধিক লজ্জা পাইব আমি

সীতা আনিলে ঘরে।।” (মুখোপাধ্যায় ৫২৭)

অর্থাৎ, ‘একেশ্বরী’ সীতার এই শেষ বনবাসী জীবনের মধ্যে দিয়েও দেখা যাচ্ছে পুরুষকেন্দ্রিক পরিবারের মধ্যে সীতা কীভাবে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কিংবা লোকের কথাকে প্রাধান্য দিয়ে নিরাপরাধী স্ত্রী-কে ঘরে রাখবে কিনা সেটা নিয়ে স্বামীর মানসিক টানাপোড়েনেও পৌরুষের অহংকার জয়ী হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এর বিপরীতে বাল্মীকির রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক সীতার আশ্রয়ের ভার দেওয়া হল তপোবনের ‘তপস্বিনী নারী’দের (শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ (দ্বিতীয় খণ্ড) ৮৩৮) হাতে। আক্ষরিক ভাবে পুরুষের আশ্রয়ের আওতার বাইরে শুরু হল সীতার অন্য এক বনবাসী জীবন। যেখানে সন্তান প্রসব করা থেকে সন্তান বড় করা পুরো ক্ষেত্রটাই রচনা করা হল এই তপোবনের মধ্যে। আপাত দৃষ্টিতে তপস্বিনী পরিবৃত সীতার জীবন, সীতার মা হয়ে ওঠা, সন্তানের লালনপালন - এই সব কিছু মিলিয়ে বনবাসী জীবনকে একান্তভাবেই অন্তঃপুরবাসী জীবনের মতোই সামাজিক পরিসর থেকে দূরবর্তী মহিলা-মহল বলে মনে হতে পারে। আর সেই ধারণা থেকেই মনে করা যায়, হয়তো *Sita's Ramayana* - তে হনুমান লব-কুশকে রাজপরিবারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলেছে “They are warriors, both of them, they are not meant for the forest life.” (আর্নি ১৪২) অর্থাৎ, রাজপরিবারের সন্তান হিসেবে, যোদ্ধা হিসেবে সর্বোপরি পুত্র সন্তান হিসেবে এই নারী পরিবৃত স্থান তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু, রাজ্য-রাজপরিবার-রাজনৈতিক পরিসর থেকে দূরে বাল্মীকির সহায়তায় সীতার পরিচর্যাতেই বেড়ে উঠতে থাকে লব-কুশ। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে পাওয়া যায় –

“ব্যাকরণ আদি বিদ্যা গো দুই পুত্রেরে পড়ায়।

ধনুক বাণ হস্তে দিয়া গো যুদ্ধ বিদ্যা যে শেখায়।।

দুই পুত্র সীতাদেবীর গো, মায়ের কোল জুড়া।।” (চক্রবর্তী ২৩৩)

অর্থাৎ, স্থানিক অবস্থানকে একপ্রকার নাকচ করে দিয়ে বনবাসী জীবনেও যে ‘একেশ্বরী’ সীতার পক্ষে সন্তান পালন সম্ভব শুধু তাই নয় তাদের যোদ্ধা করে তোলাও যে সম্ভব সে প্রমাণ পাওয়া যায় বীর হনুমানের লব-কুশের কাছে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে। যদিও এই সার্থকতার জৌলুস স্নান হয়ে যায় পুনরায় সন্দেহ, পুনরায় অগ্নি পরীক্ষা এবং সব শেষে সীতার পাতাল প্রবেশের ঘটনায়। ক্রিস ব্যাসলে তাঁর *Gender and Sexuality* গ্রন্থে লিঙ্গ-ধারণার প্রসঙ্গে বলেছেন – “The gendering process frequently involves creating hierarchies between the divisions it enacts.” (১১) আসলে সমাজ নির্ধারিত নারী-পুরুষের অবস্থানগত যে পার্থক্য, তাদের মধ্যকার ‘উচ্চ-নীচ’ ধারণায় যে মানসিক পার্থক্য সেই হেতুই পুরুষশাসিত সমাজে বারবার নারীকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, প্রমাণ করতে হয় – তার উপস্থিতি, তার নারীত্ব, তার শুদ্ধতা।

তাই, কথা শেষে বলতে হয় রাম-কাহিনির চিরাচরিত ধারায় আখ্যানের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি বা কাহিনিকারের হাত ধরে বারবার মোড় ঘুরলেও পৌরুষের বিপরীতে রাম-কথায় নারীর বহুমাত্রিক অবস্থান আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যেখানে তারা ক্ষমতায়নের বৈপরীত্যের লড়াইয়ে সামাজিক পরিসরে নিজেদের মতো করে স্ব-ক্ষমতার সূত্রে একটা স্বকীয় জায়গা তৈরি করতে সক্ষম। আর সেই লড়াইয়ে ত্রিজটার দূরদর্শীতা মিলে যায় মহর্ষি বাল্মীকির সঙ্গে, পুরুষের হিংসা-যুদ্ধ কাহিনির সাথে মিশে যায় তাড়কা-শূর্পনখার ভয়ঙ্কর আগ্রাসন কিংবা সীতা রক্ষাকারী রাম-মাহাত্ম্যের অভিমুখ ঘুরে যায় অসীতা কর্তৃক রাম উদ্ধারে। যেখানে শুধুমাত্র চন্দ্রাবতীর সীতাই “স্বয়ং সীতা” (মিদ্দে ২০৬) নয় বরং বিভিন্ন রাম-আখ্যানের প্রায় সব নারী চরিত্রই তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও স্বকীয় ভাবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু, এসবের

পরেও নবনীতা দেবসেনের থেকে ঋণ নিয়ে বলতে হয় মহাকাব্যে নারীর অবস্থান “শাঁখের করাত”-এর (দেবসেন ১৮) মতো। নবনীতা দেবসেনের মতে পুরুষ সৃষ্ট মহাকাব্যের ধাঁচায় নারীর উপস্থিতি শুধুমাত্র পুরুষের জয়, খ্যাতি, গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ব্যতীক্রম থাকলেও নারীর অবস্থানের একমুখীনতাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। আসলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে এই টানাপোড়েনকে কোনো রাম-আখ্যানই অস্বীকার করেনি। বরং, চিরায়ত রাম-কথার ধারার মধ্যেই একটা ব্যতিক্রমী সুর তার নিজের মতো করে সৃষ্টি হয়েছে এবং সহাবস্থান করেছে। অর্থাৎ, রামায়ণের সময়-সমাজ-সাংস্কৃতিকে আমরা যেমন উপেক্ষা করতে পারিনা, তেমন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা সম্পূর্ণত গ্রহণ করতেও পারিনা। ফলত, ক্রমাগত ভাঙা-গড়ার একটা দোটা কাঁজ করে রাম-আখ্যান পাঠের ক্ষেত্রে, তাকে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। আর সেটা আছে বলেই বর্তমান সময়ের লিঙ্গ ভিত্তিক নানা প্রশ্ন নানা তর্ক বিতর্কের মধ্যেও রাম-আখ্যানের অন্দরের লিঙ্গ ধারণার পুনর্নির্মাণের সুস্পষ্ট স্বর আজও পাঠককে রামায়ণ ফিরে দেখতে, পড়তে, বুঝতে, ভাবতে শেখায়।

Bibliography:

আকর গ্রন্থ -

চক্রবর্তী, কোয়েল, *চন্দ্রাবতীর জীবন ও রামায়ণ*, দে বুক স্টোর, ২০১৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসনৎকুমার, অনুবাদক, *শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ (প্রথম খণ্ড)*, গীতা প্রেস, ২০২৪

শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ (দ্বিতীয় খণ্ড), গীতা প্রেস, ২০২৩

মুখোপাধ্যায়, সুখময়, সম্পাদক, *রামায়ণ : কৃত্তিবাস পণ্ডিত-বিরচিত*, ভারবি, ২০১৬

Arni, Samhita and Moyna Chitrakar. *Sita's Ramayana*. Tara Books, 2012

সহায়ক গ্রন্থ -

তর্করত্ন, পঞ্চগনন, সম্পাদক, *বিষ্ণুপুরাণম*, ১৯০৭, পৃ. ১৭

দেবসেন, নবনীতা, *চন্দ্র-মল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ*, দে'জ-পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ১৮

মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন, সম্পাদক, *দশদিশি*, 'বিষয় : কৃত্তিবাসী রামায়ণ', ২০১৭

'মাধব কন্দলীর 'রামায়ণ' এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ : একটি তুলনামূলক পাঠ প্রতিক্রিয়া', অপর্ণা রায়, পৃ. ১৬৮-১৮৪

'কৃত্তিবাস ও চন্দ্রাবতী রামায়ণের দুই সীতা', সুরঞ্জন মিত্তে, পৃ. ১৯৯-২০৬

হোসেন, পারভেজ এবং ফয়েজ আলম, সম্পাদক, *জ্যাক দেরিদা: পাঠ ও বিবেচনা*। সংবেদ প্রকাশনা, ২০০৬

'অবিনির্মাণ-অনুবাদ', গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিডাক, পৃ. ১১-২৮'

'জ্যাক-দেরিদার বিনির্মাণ প্রসঙ্গ ও হাইডেগার', মৃগালকান্তি ভদ্র, পৃ. ১৩৩-১৪৮

Beasley, Chris. *Gender & Sexuality*. SAGE Publication, 2005, p. 11

Brownmiller, Susan. *Against Our Will: Men, Women and Rape*. Fawcett Columbine, 1975, p. 18

Makkar, Pooja. 'Interrogating Family Values : Analysing Women Characters From the Epic Ramayana.' 2018, Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Ph.D. Thesis. n. p

Wolf, Naomi. *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*. Harper Collins, 2002, pp. 90, 155